ISSN 2519-6030

উত্তরা ইউনিভার্সিটি

লেখনী

ভাষা,সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক জার্নাল

Lekhani : A Journal of Language, Literature and Culture

প্রথম সংখ্যা, মাঘ ১৪২৩
Volume 1, January 2017

Uttara University

খায়রুন নিসা*

স্ত্রীশিক্ষা : রবীন্দ্র-দৃষ্টিভঙ্গি

সারসংক্ষেপ : *নারী-স্বাধীনতা ও নারী-শিক্ষা সংক্রান্ত ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশিষ্ট, অগ্রসরমান ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে। সেখানে তিনি সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে নারী-স্বাধীনতা ও নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে নারীর প্রতি দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় থাকলেও 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে নারীকে সভ্যতা বিকাশের সোপান হিসেবে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। নারী-শিক্ষা ও নারী-স্বাধীনতা প্রসঙ্গে 'স্ত্রী শিক্ষা : রবীন্দ্র-দৃষ্টিভঙ্গি' শীর্ষক প্রবন্ধটি বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ করার একটি প্রয়াসমাত্র।*

উনিশ শতকের বাংলা নবজাগরণের কালে নারীর মহিমা শিক্ষিত বাঙালিকে মোহিত করলেও নারী-স্বাধীনতা ও নারী-শিক্ষা সম্পর্কে তাদের মতানৈক্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের মতো নবজাগরণের অনিবর্চনীয় স্তম্ভ বাঙালির বৈষয়িক ও আত্মিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকলেও তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনের বেশ কাল ধরে এই দ্বিধা থেকে মুক্ত ছিলেন না। রবীন্দ্র চিন্তায় তাই বরাবার ফিরে এসেছে সে-দ্বৈত ও দ্বৈধ দৃষ্টিভঙ্গির কথা। তাহলেও, রবীন্দ্রনাথের নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আধুনিক, সাহিত্যের নানা শাখায় সে-আধুনিকতার স্পর্শ আমরা পেয়ে থাকি। নারী এবং প্রকৃতি এই দুই-এ সুষমামণ্ডিত রবীন্দ্রসাহিত্য। ভাবুক ও কবি রবীন্দ্রনাথ নারীকে দেখেছেন রোমান্টিক দৃষ্টিতে। যার ফলে শত বাস্তব প্রেক্ষাপটেও নারীকে তিনি কল্পনা করেছেন তাঁর অন্তরের মানসসুন্দরীর মতো করে।

*স্নাতক সম্মান (৩য় বর্ষ, ২য় সেমিস্টার) বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট, বাংলাদেশ

রবীন্দ্র নারীচেতনা ভারতীয় ঐতিহ্যপুষ্ট এবং সাহিত্যিক ভাবনামণ্ডিত। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের সমাজসংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড বাঙালি নারীজীবনে যে-অভূতপূর্ব আলোড়ন এনেছিল রবীন্দ্র-নারীচেতনা তারই অভিঘাতের ফল। রবীন্দ্র সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা বাঙালি নবজাগরণের যথার্থ প্রতিফলন বলে পরিগণিত। নারীস্বাধীনতা এবং নারীভাবনায় রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যথেষ্ট অগ্রগতিসম্পন্ন। রবীন্দ্রসাহিত্যই এর সবচেয়ে বড়ো নির্দশন। এরপরও ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ এবং লেখক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এ-বিষয়ে ছিল দ্বন্দ্ব এবং দ্বিধা। গত দুই শতাব্দীর অন্যতম মহান পুরুষ অনেকদিন পর্যন্ত এই দ্বিধা থেকে বের হয়ে আসতে পারেননি। এমনকি তাঁর উপন্যাস-গল্প নাটক ও কবিতায় নারীর প্রতি রবীন্দ্র দৃষ্টিভঙ্গির যে-রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল মনোভাবের স্ববিরোধ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলোতে বিশেষ করে 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে তাঁর মতামতকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। সেখানে একজন সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে নারীর স্বাধীনতা ও নারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনা করেছেন। অন্তত সেখানে নারীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের দ্বৈত ও দ্বৈধ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়-ই না, বরং তিনি নারীকে মানুষ হয়ে ওঠার জন্য যে-শিক্ষা প্রয়োজন রয়েছে তা ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে। নারী শিক্ষিত হয়েও নিজের সংসার সন্তানসন্তাদির প্রতি দায়িত্ব পালনে ব্রতী হতে পারে। তবুও কিছু প্রশ্ন থেকে যায় যখন ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ এবং সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নারীশিক্ষা এবং নারীস্বাধীনতার বিষয়ে দ্বৈত আচরণ লক্ষ করা যায়। কিন্তু তিনি শেষপর্যন্ত নারীশিক্ষা ও নারীস্বাধীনতার প্রতি ঘুরে দাঁড়ান তাঁর পরিণত বয়সে। রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনায় নারীশিক্ষার বিষয়টি আসে অবধারিতভাবে। এবং ইতিবাচকভাবে অবশ্যই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্র নারীভাবনার মতো রবীন্দ্র নারীশিক্ষা-ভাবনা রবীন্দ্র কবিমনন ও জীবনদর্শন-প্রসূত।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা, অণুপ্রেক্ষিত

সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাইরেও আরও একটি সত্তা রয়েছে, যা তাকে পৃথিবীর অন্যান্য বিখ্যাত বিশ্বসাহিত্যিক থেকে স্বতন্ত্র্য মর্যাদায় আসীন করেছে। তিনি সমাজসংস্কারক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শুধু সমাজসংস্কার নয়, শিক্ষাভাবনায়ও রবীন্দ্রনাথকে গুরুত্বসহকারে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল। ঔপানিবেশিক শাসকগণ কর্তৃক আরোপিত উদ্দেশ্যমূলক ও গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার ওপর ছেলেবেলাতেই আস্থাহীন হয়ে পড়েছিলেন তিনি। ইংরেজদের মূল লক্ষ্য ছিল বেতনভুক্ত পড়াশোনা জানা কিছু উন্নতশ্রেণির 'চাকর' সৃষ্টি করা। মাত্র ষোলো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদেশের শিক্ষাব্যবস্থা প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এতেই তাঁর শিক্ষাভাবনার মৌলিকতা ধরা পড়ে। সেখানে তিনি লিখেছেন :

> বঙ্গদেশে এখন এমনি সৃষ্টিছাড়া শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে যে তাহাতে শিক্ষিতেরা বিজ্ঞান দর্শনের কতকগুলি বুলি এবং ইতিহাসের সাল-ঘটনা ও রাজাদিগের নামাবলী মুখস্ত করিতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের রুচিরও উন্নতি করিতে পারেন নাই বা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেও শিখেন নাই। (ঠাকুর, ১৩৮৯ : ৬১)

এতে অনুধাবন করা যায় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কতোটা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। শুধু তাই নয়, বাল্যকালে সঙ্গী-সাথীদের স্কুলে যেতে দেখে অনুযোগ করতেন রবীন্দ্রনাথ। যতটা আগ্রহ নিয়ে তিনি স্কুলে যান তার চেয়ে শতগুণ তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে স্কুল ছাড়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন। যদি তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা বালক রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্টই করতে পারত তাহলে শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতনের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হয়ত হতো না। ব্যক্তি তার দায়বোধ থেকে অনেক কিছু করতে চায়।

রবীন্দ্রনাথও এক প্রকার দায়বোধ থেকেই শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনার যে-বিষয়টি বস্তুনিষ্ঠভাবে ফুটে উঠেছিল তা হচ্ছে শিক্ষা শুধু ডিগ্রি অর্জনের জন্য নয় একে আত্মস্থ করতে হবে। তাঁর মেধা, মনন এবং কঠোর পরিশ্রমের ফলে শান্তিনিকেতনে এক অভিনব শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন। বিলাসিতাহীন, অনাড়ম্বর এবং দারিদ্রকে অতিক্রম করে জ্ঞানের সাধনায়ই ছিল এর মূল লক্ষ্য।

শান্তিনিকেতনের জন্য রবীন্দ্রনাথ এমন শিক্ষকের খোঁজ করছিলেন যাঁরা আধুনিক শিক্ষার শিক্ষিত হয়েও ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক। শান্তিনিকেতনে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে ঐতিহ্যের মেলবন্ধন করে পাঠক্রম চলত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিবারের সন্তানদের ওপরই সবচেয়ে বেশি এক্সপেরিমেন্ট করেছেন এবং বলা বাহুল্য যে, তিনি সফলও হয়েছেন। গ্রন্থগত-বিদ্যার সঙ্গে কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ছেলে রথীন্দ্রনাথ মুচি ও ছুতোরের কাজ পর্যন্ত নিজে করেছেন। (মামুদ, ২০১১ : ১৫৮)। এ-প্রসঙ্গে 'অসন্তোষের কারণ' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> যদি আমাদের দেশের শিক্ষায় ছাত্রদিগকে চাকরি ছাড়া অন্যান্য জীবিকার সংস্থানে পটু করিয়া তুলিত তাহা হইলে এই সম্বন্ধে নালিশের কথা থাকিত না। কিন্তু পটু না করিয়া সর্বপ্রকারের অপটুই করিতেছে এ কথা আমরা নিজের প্রতি তাকাইলে বুঝিতে পারি। (ঠাকুর, ১৪১৭ : ২৯৮)

তাই 'প্রয়োগিক' ও 'সত্যসন্ধ' শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যেমন আক্ষেপ করেছেন, কখনো-বা এমনতর শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনে নিজেও উদ্যোগগ্রহণ করেছেন; একইভাবে 'মানুষ হইয়া উঠাই শিক্ষা' রবীন্দ্রনাথের এই আপ্তবাক্যের ভেতর 'প্রাণপণ চেষ্টায় মানুষ' এমন দার্শনিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যখন ভাবিত তখন তার ভাবনায় নারীশিক্ষাও উপেক্ষিত থাকে নি। যদিও নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কবি ও দার্শনিকসুলভ।

নারীস্বাধীনতা, ঠাকুর-পরিবার ও রবীন্দ্রনাথ

উনিশ শতকের রেনেসাঁসে ঠাকুর-পরিবার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। বিশেষ করে নারীশিক্ষা ও নারীস্বাধীনতায় ঠাকুরবাড়ির ভূমিকা ছিল কিংবদন্তিতুল্য। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এ-ব্যাপারে খুব উদার ছিলেন। ঠাকুর বাড়ির ছেলেমেয়েরা গুরুপ্রদত্ত শিক্ষা থেকে শুরু করে সঙ্গীত চর্চা পর্যন্ত করতেন। তখনকার সময়ে ঠাকুর-বাড়ির নারীরা অন্যান্য নারীর চেয়ে যথেষ্ট অগ্রগামীও ছিলেন। তবুও এই গণ্ডি থেকে বের হওয়া তাদের পক্ষে সহজ ছিল না। এব্যাপারে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সমালোচকের মতে, 'মহর্ষি-পরিবার নারীজাতির উন্নতিকল্পে ক্রমশ যেসকল ব্যবস্থা স্বীকৃত হতে লাগল তার প্রবর্তনের মূলে তরুণ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন।' (সেন, ২০১২ : ২০৪) সত্যেন্দ্রনাথের অপর দুই ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথও ঠাকুরবাড়ির নারীশিক্ষা ও স্বাধীনতায় বেশ ভূমিকা রেখেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথই প্রথম ঠাকুরবাড়ির বধূকে পর্দার বাইরে নিয়ে আসার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, বিলেত থেকে সত্যেন্দ্রনাথ হেমেন্দ্রনাথের প্রতি পত্র লিখে জ্ঞানদানন্দিনীকে ইংরেজি শেখাবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সাহিত্য সংস্কৃতিচর্চায় ঠাকুর বাড়ির মেয়েরা সহজেই আত্মনিয়োগ করতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের বড়ো বোন স্বর্ণকুমারী দেবী সাহিত্যচর্চা করতেন। তিনি তাঁদের পারিবারিক ভারতী পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

তাঁর দুই মেয়ে সরলা এবং হিরন্ময়ী সাহিত্যসাধনায় ব্রতী ছিলেন। স্বর্ণকুমারীর মৃত্যুর পর ভারতীর সম্পাদনার কাজ দুই বোন মিলে করতেন। সরলা এবং হিরন্ময়ী মিলে মেয়েদের জন্য একটি পাঠশালাও খুলেছিলেন নিজের বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথের বৌঠান কাদম্বরী দেবী কলকাতার রাস্তায় প্রথম ঘোড়ার গাড়ি করে বেড়িয়েছিলেন । তখনকার যুগে বলতে গেলে এটি একটি অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল। জ্ঞানদানন্দিনী সিভিল সমাজে চলার জন্য নিজেকে যথার্থ উপযোগী করে তুলেছিলেন। একাকী তিনি বিলেতেও পাড়ি জমিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী পড়াশুনা শেষ করে ২৬ বছর বয়সে বিয়ে করেন এবং সরলা বিয়ে করেন ৩৩ বছর বয়সে। সরলা দেবী ইংরেজি সাহিত্যে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করে স্বর্ণপদক প্রাপ্তও হন। এ-প্রসঙ্গে চিত্রা দেব লিখেছেন :

> অসংখ্য বাধানিষেধের গণ্ডি পার হয়েই মেয়েদের, এমনকী ঠাকুর বাড়ি মেয়েদের আত্মপ্রকাশ করতে হয়েছিল। সহজে হয়নি। প্রথমদিকে এ বাড়ির মেয়ে এবং বউয়েদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ শক্তির পরিচয় রেখে গিয়েছেন, কিন্তু যাঁদের নাম বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়েনি, পড়বার কারণও নেই, তাঁদের ভূমিকাও নেহাত কম ছিল না। চলবার বাঁধা-পথ তাঁরা পাননি, পথ তাঁদের তৈরি করে নিতে হয়েছিল। (দেব, ২০১৪ : ২)

সুতরাং বলা যায় যে, উনিশ শতকের নারীআন্দোলনে সত্যেন্দ্রনাথের দান প্রধানত তাঁর পরিবারের মধ্য দিয়েই লাভ করেছে। অর্থাৎ, 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের প্রধান একটি কেন্দ্র দেবেন্দ্র-ভবন, বঙ্গনারীর আত্মবিকাশের উদ্যোগ এই পরিবারের কন্যা ও বধূদের দ্বারা এককালে অনেকখানি পুষ্টি লাভ করেছে।'(সেন, ২০১২ : ২০৪) কিন্তু তা সত্ত্বেও খটকা লাগে একটি বিষয়ে যে, রবীন্দ্রনাথের কন্যাসন্তানেরা ঠাকুরবাড়ির সন্তান হয়েও তারা ইন্দিরা-সরলার মতো শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারেন নি। আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো রবীন্দ্রনাথ তাঁর তিনটি মেয়েকেই বাল্যবিবাহ দিয়েছেন। বাল্যবিবাহের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেনও বিস্তার। লিখেছেন কিন্তু নিজেই তা রক্ষা করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বাল্যবিবাহ করেছিলেন। কিন্তু উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে এটা মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু তিনি তাঁর মেয়েদের জন্য যথার্থ শিক্ষার পর্যন্তও ব্যবস্থা করতে পারেন নি। এমনকি তিনি যখন অর্থকষ্টে ছিলেন তখনও পুত্র রথীন্দ্রনাথকে ইংল্যান্ডে পাঠিয়েছিলেন কৃষিবিষয়ক উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণের জন্য। অন্যদিকে, মেয়েদের বাল্যবিবাহ দেওয়ার বিষয়টিকে নিয়ে অনেকেই তাঁকে ঠাট্টা পরিহাস করেছেন। কারণ শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ ব্রাহ্ম-সমাজের সদস্য 'স্ত্রী-স্বাধীনতার দল নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮৭২-৭৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে তাঁরা বাল্যবিবাহের বিপক্ষে, স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে সংগঠিত হয়েছিলেন।'(ঘোষ, ২০১৫: ৮)

নারী-স্বাধীনতা এবং শিক্ষার বিষয়টির প্রতি সম্মতি দিতে দ্বিধায় ছিলেন তিনি যা পরবর্তীতে তাঁর সামনে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে রবীন্দ্রনাথ রক্ষণশীল মানুষ ছিলেন? তিনিই তো যোগাযোগ, চার অধ্যায়, ঘরে বাইরে, চোখের বালি লিখেছেন। সৃষ্টি করেছেন মৃণাল, অনিলা, ইলা , বিমলা, বিনোদিনী, সোহিনীর মতো চরিত্র। সুতরাং এমন মন্তব্য আমরা তাঁর ওপর চাপিয়ে দিতে পারি না। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে কেন এমন রক্ষণশীলতার পরিচয় দিবেন রবীন্দ্রনাথ এ-প্রশ্ন থেকেই যায়।

রবীন্দ্রসাহিত্য নারী সুষমায় মণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথের নারীরা মমতাময়ী, দরদী, স্নেহপ্রবণ এবং বাৎসল্যপ্রীতিসম্পন্ন। নারীর সার্থকতা মাতৃত্বে। নারীর অন্য স্বাধীনতা থাকবে ঠিকই কিন্তু নারীকে নারী হয়েই থাকতে হবে। এই নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যই নারীর সার্থকতা। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট অভিমত হচ্ছে :

> আসল কথা এই, স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া, মেয়েদের স্বভাব; দাসী হওয়া নয়। ভালবাসার অংশ মেয়েদের স্বভাবে বেশি আছে-এ নহিলে সন্তান মানুষ হইত না, সংসার টিকিত না। স্নেহ আছে বলিয়াই মা সন্তাদের সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই, প্রেম আছে বলিয়াই স্ত্রী স্বামীর সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই। (ঠাকুর, ১৪০৭ : ২৮৭)

রবীন্দ্র রোমন্টিকতার মূলে রয়েছে নারী এবং প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথের নারী সম্পর্কে যে মতামত ছিল তা সমাজ, রাষ্ট্র এবং যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র দৃষ্টিভঙ্গিরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতায় সম্মতি দেন রবীন্দ্রনাথ। দীর্ঘ জীবনের দ্বিধা ভেঙে নতুনভাবে নারীকে উপলব্ধি করে তিনি লিখছেন 'পয়লা নম্বর', 'স্ত্রীর পত্র', 'ল্যাবরেটরি'র মতো অসাধারণ ছোটগল্প, যেখানে নারীকে তিনি দিয়েছেন চিন্তা করার পরিসর, ব্যক্তিমানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস। এসব 'বাস্তব সংসারজীবনে নারীর অসহায় বন্দিত্ব ও মুক্তির বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে।' (মোমেন, ২০১২ : ১৪২) চোখের বালি (১৯০৩), যোগাযোগ (১৯২৯), চার অধ্যায় (১৯৩৪) ঘরে বাইরে (১৯১৫) উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ নারীমুক্তির পথনির্দেশ করেছেন। এ-প্রসঙ্গে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের অভিমত প্রণিধানযোগ্য :

> নারীজীবনের সার্থকতা সমন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা শেষতম পরিচয়স্থল 'স্ত্রীর পত্র' গল্প। তিনি একসময় বিশ্বাস করতেন, নারীজীবনের চরম সার্থকতা মাতৃত্বে ('শকুন্তলা', 'কুমার সম্ভব' ও 'শকুন্তলা,/ প্রাচীন সাহিত্য)। বর্তমান শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত এ বিশ্বাস বজায় ছিল। (মুখোপাধ্যায়, ২০১১ : ৭৪)

রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প এবং উপন্যাসের এই নায়িকাদের অঙ্কন করেছেন শিক্ষিত নারীচরিত্র হিসেবে। মৃণাল, হৈমন্তী, অনিলা, বিমলা, ইলা, কুমুদিনী প্রভৃতি এর উদাহরণ। মৃণাল চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের অনন্য সৃষ্টি। তিনি মৃণালকে কবিত্ব শক্তি দিয়েছেন। মৃণালের মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথ এতদিনের না-বলা কথার স্ফুরণ ঘটিয়েছেন। সেই সময়ের প্রেক্ষিতে মৃণালের মতো চরিত্রনির্মাণ করা অনেক লেখকের জন্যে দুঃসাধ্যই ছিল। তৎকালীন বিদ্বান-সমাজের মধ্যে অনেকেই মৃণালের উপস্থিতিতে মেনে নিতে পারেন নি। এ-প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন :

> সুবজপত্রে 'স্ত্রীর পত্র' গল্প প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য ও সমাজে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। নারায়ণ মাসিক পত্রে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পাল তীব্র প্রতিবাদ করেন। নারায়ণ-এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্ত্রীর পত্রের', প্যারডি 'মৃণালের কথা'। (মুখোপাধ্যায়, ২০১১ : ৭৫)

রবীন্দ্রনাথ যে নারীস্বাধীনতার সমর্থক এর থেকে বড়ো প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে মৃণালের কণ্ঠস্বর শুনলে আমরা চমকে যাই :

> আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্যার বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জান নি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাঁশ যাই হোক না, সেইখানে, তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠে নি। সেইখানে আমার মুক্তি; সেইখানে আমি আমি। আমার মধ্যে যা কিছু তোমাদের মেজো বউকে ছাড়িয়ে রয়েছে সে তোমরা পছন্দ করনি, চিনতেও পারনি, আমি যে কবি সে এ পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়েনি। (ঠাকুর, ২০০৭ : ৪৯৯)

নারীর নিজস্ব পরিসর এভাবেই রবীন্দ্রনাথ সন্ধান করার চেষ্টা করেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে।

স্ত্রী-শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমতি লীলা মিত্রের একটি পত্রের জবাবে রবীন্দ্রনাথ 'স্ত্রীশিক্ষা' যে-প্রবন্ধটি রচনা করেন তাতে নারীশিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্র দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিষয়টি ছিল সমকালীন একটা আলোচ্য বিষয়। নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা। সমকালীন আলোচনার প্রেক্ষিতে লীলা মিত্র স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে এবং বিপক্ষে পুরুষদের যে-রূপ অবস্থান তার উল্লেখ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে, পুরুষদের মধ্যে একদল তাদের স্ত্রীকে তাদের যোগ্য করে তোলার জন্য স্ত্রীশিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন; আরেকদল আছেন যারা মনে করেন স্ত্রী শিক্ষিত হলে বরং তাদের বিপদ, কারণ তখন তাদের ব্যক্তিগত সুখের বিঘ্ন ঘটবে। আবার একশ্রেণির পুরুষ রয়েছেন যারা কি-না নারী এবং পুরুষ-উভয়ের শিক্ষাদানে সমর্থন করে থাকেন এবং তারা অবশ্য অন্য দশটা পুরুষের পর্যায়ে পড়েন না।

উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, স্বামীরা নিজেদের জন্য শিক্ষিত স্ত্রী ভাবতেই পারেন না। তাদের স্ত্রীরা হবে সন্তানের জননী, সেবাপরায়ণ, অনুগত এবং স্নেহপ্রবণ। গুটিকয়েক শিক্ষিতার ব্যাপারে এ-কথা স্পষ্টতই বলা যায় যে, তাদের স্বামীরা নিজেদের সুবিধার্থে, সমাজে মাথা উঁচু করে চলতে, কাঠের পুতুল স্ত্রীকে শিক্ষিত করে তোলেন। আর তারা শিক্ষাব্যবস্থার এমন একটি আদল তৈরি করে দিয়েছেন যে, নারী শিক্ষিত হয়েও পুরুষের অধীনে থাকবে ঔপানিবেশিক শাসনব্যবস্থার মতো। তবে আর নারী শিক্ষা কেন? কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একে ব্যাখা করেছেন অন্যভাবে। তিনি মনে করেন নারীর একটি কোমল সত্তা থাকবে। নারী হবে সুন্দর ও মনোহরা। তিনি মনে করেন যেহেতু নারী এবং পুরুষ সৃষ্টিলগ্ন থেকেই দুটি আশ্চর্য উদ্ভাবন এবং এ-দুইয়ের দৈহিক এবং আচার-আচরণগত স্বাতন্ত্র্য রয়েছে সেহেতু এই বিষয়টি আমাদের সহজেই মেনে নিতে হবে। কিন্তু এর মাধ্যমে তিনি লিঙ্গ-বৈষম্য তুলে ধরেন নি । 'স্ত্রী-শিক্ষা' প্রবন্ধে এ-বিষয়ে বলেছেন :

> জীবলোকে এই যে একটা ভেদ ঘটিয়াছে এই ভেদের মুখ দিয়া একটা প্রবল শক্তি পরম আনন্দের উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। ইস্কুল-মাস্টার কিংবা টেক্সটবুক-কমিটি তাঁহাদের এক্সোইজের খাতা কিংবা পাঠ্য ও অপাঠ্য বইয়ের বোঝা দিয়া এই শক্তি এবং সৌন্দর্য প্রবাহের মুখে বাঁধ বাঁধিয়া দিতে পারেন, এমন কথা আমি মানি না। মোটের উপর, বিধাতা এবং ইস্কুল-মাস্টার এই দুইয়ের মধ্যে আমি বিধাতাকে বেশি বিশ্বাস করি। সেইজন্য আমার ধারণা এই যে , মেয়েরা যদি-বা কান্ট-হেগেল্‌ও পড়ে তবু শিশুদের স্নেহ করিবে এবং পুরুষদের নিতান্ত দূর-ছাই করিবে না। (ঠাকুর, ১৪০৭ : ২৮৬)

রবীন্দ্রনাথ এটি স্পষ্ট করে বলেছেন যে, নারীর প্রতি যদি বৈষম্য করা হয় তাহলে ঈশ্বরকেও অবমাননা করা হবে। তাই নারীর মানুষ হয়ে উঠতে প্রয়োজন শিক্ষা এবং তা অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ এ-কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাই বলে তাদের গ্রন্থগতবিদ্যার অধিকারী হতে হবে এমন কোনো কথা নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথ এই তথাকথিত শিক্ষা কিন্তু ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের জন্যও ধার্য করতে চান নি! যার ফলে শান্তিনিকেতন হলো। বরং মেয়েদের যথার্থ মেয়ে করে গড়ে তোলার জন্য যে-ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রয়োজন তার ওপরও গুরুত্বারোপ করেছেন। মেয়েরা মেয়ে বলেই যে তাদের স্বতন্ত্র রক্ষা করে চলতে হবে এটাও কিন্তু অনেকে বাড়াবাড়ি হিসেবে দেখেন।

রবীন্দ্র স্ত্রীশিক্ষা-ভাবনা প্রসঙ্গে সুশান্ত সরকারের মূল্যায়ন নিম্নরূপ :

> রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীশিক্ষা নারীশিক্ষার বিষয়টি নিয়ে ভেবেছেন, শুধু তাই নয় স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ছিল যা কিছু জানার যোগ্য তাই বিদ্যা, তা পুরুষকেও জানতে হবে, মেয়েকেও জানতে হবে। শুধু কাজে খাটাবার জন্য যে তা নয়, তা জানার জন্যই।...সুতরাং মেয়েদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। তাই বলে তিনি মনে করেননি-শিক্ষা প্রণালীতে মেয়ে-পুরুষ কোনো ভেদ থাকবে। বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চায় মেয়েপুরুষে কোনো পার্থক্য নেই। স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া মেয়েদের স্বভাব, দাসী হওয়া নয়-তাই তাকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। (সরকার, ২০১১ : ১৯)

কিন্তু সমাজের ভাবনা ঠিক উলটো, যা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায় নি। এবং পুরুষতান্ত্রিক এ-মনোভাবকেই নারীর মানুষ হয়ে ওঠার পথে প্রধান বাধা বলে তিনি চিহ্নিত করেছেন :

> মানুষকে পুরা পরিমাণে মানুষ করিব এ কথা আমাদের সকলের অন্তরের কথা নয়। যখন সর্বসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব হয় তখন একদল শিক্ষিত লোক বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা চাকর পাইব কোথা হইতে?... মেয়েদের সম্বন্ধে সেই এক কথা যে, তারা যদি লেখোপড়া শেখে তবে সে ঝাঁট বঁটি ও শিলনোড়া বাবুদের ভাগে পড়ে। (ঠাকুর, ১৪০৭ : ২৮৬)

অর্থাৎ, মেয়েদের শিক্ষা দিলে তার পতিভক্তি, হরিভক্তির ব্যাঘাত ঘটবে, ঝাঁটা, বঁটি, শিলনোড়ার কাজটা কে করবে-এই যুক্তিতে মেয়েদের শিক্ষা লাভ থেকে অনেকে বঞ্চিত করতে চান। এই 'অনেকে' বলতে রবীন্দ্রনাথ পুরুষ ও পুরুষতন্ত্রকেই ইঙ্গিত করেছেন। ইঙ্গিত করেছেন সামন্ততন্ত্র ও সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতাকে। স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতায় এরাই পথের কাঁটা। কেননা, আমাদের যে-সমাজব্যবস্থা তাতে তো শিক্ষিত নারীকেও যথার্থ মর্যাদা দেওয়া হয় না। তারা অনেক বিষয় নারীদের ওপর চাপিয়ে দেন; পুরুষরা কর্তৃত্ব করছে সবখানেই নারীরা কেবল আনুগত্য শিখেছে এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ সহজভাবে নিতে পারেন নি। বরং এতে সমাজের প্রতি হয়েছেন বীতশ্রদ্ধ। শুধু তাই নয় তিনি এসব নিয়ে সমাজকে কটাক্ষ করেছেন নিষ্ঠুরভাবে।

অন্যদিকে নারীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্নতর। তিনি একজন কবি ও দার্শনিকের দৃষ্টিতে দেখেছেন নারীকে। নারী-পুরুষের সম্পর্ককে যেমন দেখেছেন রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, নারীদের শক্তি ও শিক্ষাকেও দেখেছেন অনেকটা ওই চোখে। এর ফলে বাস্তাববাদীদের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের একটা সংঘাত তৈরি হয়। কিন্তু রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তার দার্শনিক ভিত্তি বুঝে নিলে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রচিন্তার ভুল ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে না। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন :

১. মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপরে মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে, একথা মানিতে দোষ কী? (ঠাকুর, ১৪০৭ : ২৮৬)

২. পুরুষ এতদিন কেবলমাত্র গায়ের জোরেই মেয়েদের কাঁধের উপর এই অনুগত্যটা চাপাইয়া দিয়াছে। জগতের সর্বত্রই এই কথাটা যদি এতদিন ধরিয়া সত্য হইয়া থাকে, যদি মেয়েদের প্রকৃতির বিরুদ্ধে পুরুষের শক্তি তাহাদিগকে সংসারের তলায় ফেলিয়া রাখিয়া থাকে তবে বলিতে হইবে,

দাসত্বই মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক। দাসত্ব বলিতে এই বোঝায়, দায়ে পড়িয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরের দায় বহন করা। যাদের পক্ষে এটা প্রকৃতিসিদ্ধ নয়, তারা বরঞ্চ মরে তবু এমন উৎপাত সহ্য করে না। (ঠাকুর, ১৪০৭ : ২৮৭)

৩. কিন্তু তাই বলিয়া এ কথাটা উড়াইয়া দেওয়া যায় না যে, সমাজে মেয়েরা যে ব্যবহারের ক্ষেত্রটি অধিকার করিয়াছে সেখানে স্বভাববশতই তারা আপনি আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বাহিরের কোনো অত্যাচার তাহাদিগকে বাধ্য করে নাই। (ঠাকুর, ১৪০৭ : ২৮৮)

এসব বক্তব্য ও যুক্তিতর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা উপলব্ধি করি রবীন্দ্র জীবনদর্শনের গভীরতর দিক। যার প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, নাটক, গান, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ, ভাষণ এবং অবশ্যই তাঁর শিক্ষাচিন্তায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের দুটি মূল বিষয় হলো মুক্তি ও আনন্দ। তাঁর সাহিত্যকর্ম থেকে এ-দুই বিষয়ে এ-ব্যাপারে বিস্তৃত জানা যায়। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'মেয়েদের শরীরের এবং মনের প্রকৃতি পুরুষের হতে স্বতন্ত্র' বলে 'তাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র স্বভাবতই স্বতন্ত্র'। নারীরা সন্তান-ধারণ ও প্রতিপালন করে। স্নেহ-প্রেম তাদের মজ্জাগত। সে-কারণেই 'মেয়েদের সংসারে কোনো কারণে যেখানে তাদের ভালোবাসা নাই সেখানেও তাহাদিগকে সমাজ ভালোবাসার আদর্শেই বিচার করিয়া থাকে।' (ঠাকুর, ১৪০৭ : ২৮৮) অন্যদিকে ভালোবাসার ধর্মই আত্মসমর্পণে, এবং তার গৌরবও তাতেই। সুতরাং যেটাতে আনুগত্য বলে লজ্জা করা হচ্ছে সেটা লজ্জার বিষয় হয় যদি তাতে প্রীতি না থাকে। অর্থাৎ,

> মেয়েরা আপনার স্বভাবের দ্বারাই সমাজে এমন একটা জায়গা পাইয়াছে যেখানে সংসারের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করিতেছে। যদি কোনো কারণে সমাজের এমন অবস্থা ঘটে যাতে এই আত্মসমর্পণ ভালোবাসার আদর্শ হইতে বহুল পরিমাণে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা মেয়েদের পক্ষে পীড়া ও অবমাননা। (ঠাকুর, ১৪০৭ : ২৮৮)

রবীন্দ্রনাথ এও মনে করেন, মেয়েরা স্বভাবতই ভালোবাসে এবং একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণের আদর্শকেই সামাজিক শিক্ষায় তাদের মনে বদ্ধমূল করে দিয়েছে, এই সুবিধাটুকু ধরে অনেক পুরুষ তাদের প্রতি অত্যাচার করে। শুধু তাই নয়, তাঁর মতে, সমাজে পুরুষের দাসত্ব মেয়েদের চেয়ে অল্প নয়, বরং বেশি। কেননা সভ্যতাব্যাপী পুরুষ এমন দায় বহন করে চলেছে যেখানে প্রীতি বা সৌন্দর্য কোনোটাই নেই। যেটা নারীর ভেতরে মজ্জাগতভাবে বিদ্যমান। সে-দৃষ্টিকোণ থেকেই রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের পুরুষ নয়, মেয়েদের মেয়ে হয়ে উঠবার শিক্ষার কথা বার বার উচ্চারণ করেছেন, যেখানে প্রকৃতি তার ভারসাম্য রক্ষা করে।

উপসংহার

ঔপনিবেশিক সমাজ, সামন্তবাদী পুরুষতান্ত্রিক শিক্ষা এবং সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের নারীচিন্তা ছিল চিরন্তন। তিনি নারীকে দেখেছেন মানবীরূপে, যে-নারীর মধ্যে মায়া, মমতা, মাতৃত্ব এবং সহনশীলতা থাকবে। নারীর এই ক্ষেত্রগুলো তো পুরুষ পরিপূর্ণ করতে পারে না। স্ত্রীশিক্ষার বিপক্ষে ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ, বরং তিনি বলেছেন 'মানুষ জানিতে চায়, সেটা তার ধর্ম; এইজন্য জগতের আবশ্যক সকল তত্ত্বই তার কাছে বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে।

সেই তার জানিতে চাওয়াকে যদি খোরাক না জোগাই কিংবা তাবে কুপথ্য দিয়া ভুলাইয়া রাখি তবে তার মানব প্রকৃতিকেই দুর্বল করি, একথা বলাই বাহুল্য।' (ঠাকুর, ১৪১০ : ২৮৬) মন্তব্যটি নারী-পুরুষ উভয়কে উদ্দেশ্য করেই বলা। সেদিক থেকে জীবনের একটা সময়ে হয়ত রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করেছেন কিন্তু পরিণত বয়সে এসে তিনি আন্তরিকতার সঙ্গেই স্ত্রীশিক্ষাকে গ্রহণ করেছেন এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শুধু তাই নয় শিক্ষাপ্রণালিতে মেয়ে পুরুষে বিভেদকে বিধাতাকে অমান্য করার সমতুল্য ভেবেছেন। বরং মেয়েদের 'মেয়ে হিসেবে' গড়ে তোলার জন্য 'বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা'র চেয়ে 'ব্যবহারিক শিক্ষা'র প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শুধু তাই নয় শিক্ষাপ্রণালিতে মেয়ে পুরুষে বিভেদকে বিধাতাকে অমান্য করার সমতুল্য ভেবেছেন। বরং মেয়েদের 'মেয়ে হিসেবে' গড়ে তোলার জন্য 'বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা'র চেয়ে 'ব্যবহারিক শিক্ষা'র প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন আর মানুষ হয়ে ওঠার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষার কথা বলেছেন। কেননা, যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে নারী-পুরুষের পার্থক্য নেই, কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই। আর এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেকের দ্বিমত। কিন্তু রবীন্দ্র জীবনদর্শনের দিক থেকে তা যথার্থ হিসেবে আমরা মনে করি।

তথ্যনির্দেশ

ঘোষ, সুদক্ষিণা (২০১৫)। 'রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনা'। সাপ্তাহিক আজকাল (৭/৮/১৫)। সম্পা.: মনজুর আহমেদ। নিউ ইয়র্ক;

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৮৯)। 'শিক্ষাচিন্তা'। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ। সম্পা. : সত্যেন্দ্রনাথ রায়। কলকাতা;
- (১৪১৭)। 'স্ত্রী-শিক্ষা'। রবীন্দ্র রচনাবলী (খণ্ড-১৬)। কলকাতা : বিশ্বভারতী;
- (১৪১৭)। 'অসন্তোষের কারণ'। রবীন্দ্র রচনাবলী (খখণ্ড-১৬)। কলকাতা : বিশ্বভারতী;
- (১৪১৭)। শিক্ষা। রবীন্দ্র রচনাবলী (খণ্ড-১৬)। কলকাতা : বিশ্বভারতী;
- (২০০৭)। 'স্ত্রীর পত্র'। গল্পগুচ্ছ। ঢাকা : প্রতীক;

দেব, চিত্র (২০১৪)। ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স;

মামুদ, হায়াৎ (২০১১)। রবীন্দ্রনাথ, অধরা মাধুরী। ঢাকা : শুদ্ধস্বর ২০১১;

মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার (২০১১)। কালের পুত্তলিকা : বাংলা ছোটগল্পের একশ' বিশ বছর (১৮৯১-২০১০)। কলকাতা : দেজ;

মোমেন, আবুল (২০১২)। 'মানবের বিকাশ ও রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শ'। রবীন্দ্রনাথ : এই সময়ে। সম্পা. আনিসুজ্জামান। ঢাকা : প্রথমা;

সরকার, সুশান্ত (২০১১)। রবীন্দ্রভাবনার পঞ্চ প্রান্তর। ঢাকা শুদ্ধস্বর;

সেন, পুলিনবিহারী (২০১২)। 'সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাংলার স্ত্রী-স্বাধীনতার অন্যতম পথিকৃৎ'। পুরাতনী।

সম্পা. : ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স।